মনন মাধুরী

স্বামী ভূতেশানন্দজীর স্মৃতিচারণ

স্বামী চেতনানন্দ

[৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পরমপূজনীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের ১২৫তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যতম বক্তা পূজ্যপাদ স্বামী চেতনানন্দজী আমেরিকা থেকে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে ভিডিও টেপ করে পাঠিয়েছিলেন। পরে তিনি ভাষণটি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে 'স্বামী ভূতেশানন্দ: শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি' গ্রন্থ (২০০২) থেকে তাঁর মূল্যবান ও মর্মস্পর্শী স্মৃতিগুলি যুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে 'নিবোধত' পত্রিকার জন্য পাঠিয়েছেন। এজন্য আমরা পূজনীয় মহারাজকে সকৃতজ্ঞ, সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।—সম্পাদিকা]

বন্দো সন্ত অসন্তন চরণা / দুঃখপ্রদ উভয় বীচ কছু বরণা।/ বিছুরত এক প্রাণ হরি লেই/ মিলত এক দারুণ দুঃখ দেই'' (তুলসীদাস)—আমি সাধু অসাধু উভয়েরই চরণ বন্দনা করি। হায়, উভয়েই আমার কাছে সমান দুঃখপ্রদ। অসাধু ব্যক্তি আমার কাছে এলেই তাতে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয়; আর সাধু ব্যক্তি আমাকে ছেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যায়।

অধ্যক্ষ, বেদান্ত সোসাইটি, সেন্ট লুইস, আমেরিকা

আজকাল স্মৃতিকথা বলতে গেলে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। লোকে বলে, এ স্মৃতিকথা না আত্মকথা! নিজেকে জাহির করবার জন্য কোনও মহান ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগের চেষ্টা! মহান ব্যক্তিরা আত্মজীবনী লেখেন না বা নিজেদের মহত্ত্ব প্রচার করেন না। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা

ঘনিষ্ঠভাবে এসেছেন তাঁরা ওই মহান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলেন বা লেখেন। এভাবে তাঁদের জীবনী ও স্মৃতিকথা রচিত হয় যা ভাবী কালের মানুষদের প্রেরণা জোগায়। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে পূজনীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কাছে যা শুনেছি, শিখেছি এবং তাঁকে যেমন দেখেছি—তা বলবার চেষ্টা করব। উপনিষদে একটা কথা আছে 'স্বে মহিম্নি'—নিজের মহিমায় মহীয়ান। সত্যি ভূতেশানন্দজী নিজের মহিমায় মহীয়ান ছিলেন। এই সভায় তাঁর মহত্ত্ব আলোচনা করে আমরা আনন্দিত ও আলোকিত হব।

এককথায় বলতে গেলে ভূতেশানন্দজী ছিলেন পবিত্র, প্রেমিক, পণ্ডিত, প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রেরণাদায়ক। এই পঞ্চ-পকার যুক্ত গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন। তিনি আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজে ঈশ্বরানন্দে ভাসতেন এবং সবাইকে ওই আনন্দে ভাসাতেন। আমাদের প্রিয়জনের এমনকী বাপ-মায়ের মৃত্যু হলে কয়েক মাস বা বছরখানেক পর তাঁদের আর তত মনে পড়ে না। যদিও মহারাজ ২৮ বছর (১৯৯৮-২০২৬) দেহরক্ষা করেছেন, তবু তাঁকে ভুলতে পারছি না। বক্তৃতায় ও ভক্তদের কাছে তাঁর কথা বলি। আপনাদের অনেকেই আমার সঙ্গে একমত হবেন। তাঁর ভালবাসা, সরল কথোপকথন, সাধুভক্তদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্রীয় প্রশ্নোত্তর আমাদের এখনও আনন্দ দিচ্ছে ও সংশয় নিরসন করছে।

এ-জগতে মানুষ আনন্দ ও শান্তি চায়। আর এই দুটি বস্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। আমরা দোকানে গিয়ে বলি না—৫ কেজি আনন্দ বা ২ কেজি শান্তি দাও। প্রকৃত আনন্দের উৎস সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। আমরা যে বিষয়ানন্দ ভোগ করি তারও উৎস ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪/৩/৩২) আছে, 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি'—এই ব্রহ্মানন্দেরই অংশমাত্র অবলম্বনে অপর জীবগণ জীবনধারণ করে। আগুনের কাছে গেলে আমরা তাপ অনুভব করি, তেমনি ভূতেশানন্দজীর কাছে গেলে একটা আনন্দ অনুভব হত। এটা অনেকেই অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন।

ভাগবতে আছে, ''এতাবৎ জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।/ প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা।'' (১০/২২/৩৫)—এ-সংসারে প্রাণ, সম্পত্তি, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সর্বদা জীবগণের মঙ্গল আচরণ করাতেই দেহিগণের জন্মের সার্থকতা। একেই বলে fulfilment of life। মহারাজকে দেখে মনে হত তিনি এই অবস্থা অর্জন করেছেন।

মানুষমাত্রেই কামনাবাসনা থাকবে। মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকিনি তবে জাগতিক বিষয়ে কোনও কামনা তাঁর মধ্যে দেখিনি। তিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম হয়ে ভরপুর ছিলেন। সকলের মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর একমাত্র কামনা।

পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের পরিধি ১৯৬০ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত। এই দীর্ঘ ৩৮ বছর তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি, যদিও সবসময় তাঁর কাছে থাকা সম্ভব হয়নি। তাঁর পুণ্যজীবন ও উপদেশ আমার ব্যক্তিগত জীবনে গভীর অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সেসব কথা আমি কিছু কিছু ডায়েরিতে লিখে রেখেছি। তাঁর কয়েকটি পত্রও আমার কাছে আছে। তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন কিছু টেপ রেকর্ডেও ধরা রয়েছে। যাহোক, এই দীর্ঘকালের সব ঘটনা আমার মনে

।১৪।

নেই, তবে যেগুলি প্রাসঙ্গিক সেগুলি লেখার চেষ্টা করছি।

১৪ই জুন ১৯৬০—মহারাজকে প্রথম দেখি অদ্বৈত আশ্রমে। মহারাজ রাজকোট থেকে এসেছিলেন। আমি তখন ব্রহ্মচারী। অদ্বৈত আশ্রম তখন ৪ নং ওয়েলিংটন লেনে। প্রতিদিন রাতে খাওয়ার পর ক্লাস হত। পূজনীয় গম্ভীরানন্দজী তখন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। ভূতেশানন্দজী প্রতিদিন ক্লাসের পর ঠাকুরের সন্তানদের স্মৃতিচারণ করতেন। কী মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁদের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও খুঁটিনাটি ঘটনা বলতেন! আমি সংক্ষেপে সেগুলি ডায়েরিতে লিখে রাখতাম। প্রায় ৬৬ বছর আগেকার ওই নোট থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

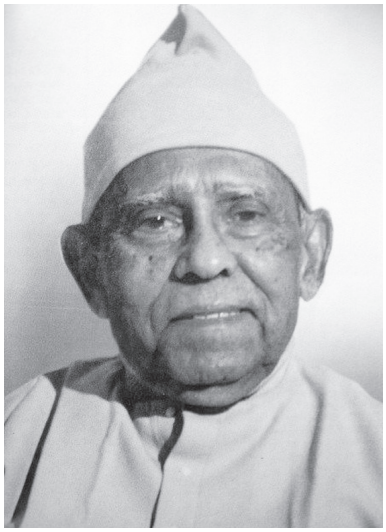

১৪ই জুন ১৯৬০, অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা।

ভূতেশানন্দজী মহারাজ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ সম্পর্কে বললেন, ''তিনি তপস্যার উপর ভীষণ জোর দিতেন। দেখলে মনে হত যেন blazing fire—জ্বলন্ত আগুন! ঘাড় সোজা করে বুক টান করে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন তখন মনে হত জগৎটা তাঁর কাছে কিছু নয়। উপেক্ষার দৃষ্টি। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) একদিন বলরাম মন্দিরে বললেন, 'ব্রাহ্মণের শরীর কেবলমাত্র তপস্যার জন্য। এ-শরীরে অন্য কোনও প্রয়োজন নেই।' একদিন 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত কোনও বইতে 'ত্বং'-এর পরিবর্তে 'তং' ছাপা হওয়ায় খুব ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলতে থাকেন, 'লোকে বলবে এখানে কতকগুলো মূর্খের আমদানি হয়েছে।' ''

১৫ই জুন ১৯৬০, অদ্বৈত আশ্রম।

এদিন ভূতেশানন্দজী শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) হৃদয়বত্তার কথা খুব বললেন, "তাঁর মন খুব নরম ছিল। সকলকেই আশ্রয় দিতেন। সকল ব্যাপারেই সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন। মায়ের দ্বারী হয়ে ছিলেন উদ্বোধনে এবং সেখানেই তাঁর শরীরত্যাগ হয়।"

মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) সম্বন্ধে বললেন, "একদিন দীক্ষার পর এক মহিলা বললেন, 'এর নাম দীক্ষা!' মহাপুরুষজী বললেন, 'কাল আবার এসো।' পরদিন ওই মহিলাকে একটু স্পর্শ করে দেওয়ায় তাঁর গভীর অনুভূতি হয়। আর একদিন মহাপুরুষ মহারাজ মঠের উঠান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তখন একজন এসে তাঁকে প্রণাম করায় তিনি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি অপ্রস্তুত। তিনি বললেন, 'ও কী করে জানবে, আমি কিছুই দেখছি না।' তিনি সদা অন্তর্মুখ অবস্থায় থাকতেন। একদিন মঠে এক বাইরের সাধু রাত্রিবাস করেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে চিনতে পারেন এবং তিনিও মহাপুরুষজীকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলে চিনতে পারেন। মহাপুরুষজী সঙ্ঘের দুর্দিনে ও বিপদে অবিচলিত থাকতেন। ঠাকুরের উপর কী দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর! একদিন ভোরে পূজারি ঘুম থেকে না ওঠায় নিজেই মঙ্গলারতি করতে যান। তিনি পরনিন্দা

।১৫।

ও পরচর্চা পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'তোমার কী হচ্ছে, তাই দেখো।' মঠের কুকুর, গরুর প্রতি কী সমবেদনা! এক গরিব জেলে মঠে মাছ নিয়ে এলে, সে যা চাইত মহাপুরুষ মহারাজ তাই দিতে বলতেন। গরিবের প্রতি কী অনুকম্পা! তাঁর জন্মদিনে ছবি তুলতে এলে বলেছিলেন, 'নিরাকারের আবার ছবি!' "

১৬ই জুন ১৯৬০, অদ্বৈত আশ্রম।

স্বামী শুদ্ধানন্দজী সম্বন্ধে ভূতেশানন্দজী বললেন, "১৮৯৭ সালে স্বামীজী কলকাতায় এলে সুধীর মহারাজ কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর গাড়ি টানেন। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁর intellectual honesty ছিল। না জানলে বলতেন, 'জানি না।' গোঁজামিলের বালাই ছিল না। খুব straightforward ছিলেন। স্বামীজীর সামনে 'আত্মা' সম্বন্ধে আধঘণ্টা বক্তৃতা দেন।

"তিনি সাধু হতে চাওয়ায় তাঁর বাবা তাঁকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখেন। লেখাপড়াই ছিল তাঁর বিশ্রাম। তিনি স্বামীজীর বহু লেখা অনুবাদ করেন। তিনি বেশ রসিক ছিলেন। বলতেন, 'আমরা সব রামকৃষ্ণের চেলা/বুক ফুলিয়ে বলা/ কেবল ভাণ্ডারা খাবার বেলা।'

"সুধীর মহারাজ খুব সহজ সরল ছিলেন। একদিন স্বামীজীকে বললেন, 'আমি তপস্যা করব।' স্বামীজী সম্মতি দিলেন। সারারাত গাছতলায় কাটিয়ে পরে ভীষণ সর্দি!

"একজন জিজ্ঞাসা করল, 'গেরুয়া পরলেন কেন?' সুধীর মহারাজ বললেন, 'সকলকেই তো এ-জগৎ ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে। গৃহে থাকলে ওপারের ডাক শুনে ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। তাই সব ছেড়ে গেরুয়া পরে এখন থেকে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি যাবার জন্য।' "

ওইদিন খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) সম্বন্ধেও ভূতেশানন্দজী অনেক কথা বললেন, "খোকা মহারাজ খুব আমোদপ্রিয় ছিলেন। সর্বদাই হাসিখুশি থাকতেন ও বীরের মতো চলাফেরা করতেন। অনেক সময় স্টিমারের মাস্থলি টিকিট নিয়ে ঘুরতে যেতেন। একবার কয়েকজন যুবক বেলুড় মঠের নিন্দা করায়, তিনি তাদের খুব বকুনি দেন। তারপর বলেছিলেন, 'বেলুড় মঠ যদি খুব আরামের জায়গা হয় তবে এখানে এসে থাক না।'

"স্বামীজী খোকা মহারাজকে তবলায় ঠেকা দেওয়া শিখিয়েছিলেন এই বোল সহ—'রামধন দাদা ছোলা খায়। দিচ্ছি দেব, দিচ্ছি দেব।' কেউ যদি ঠাকুরের কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করত, খোকা মহারাজ গম্ভীর হয়ে বলতেন, 'ঠাকুরের কথা কে শুনতে চায়?'"

১৭ই জুন ১৯৬০, অদ্বৈত আশ্রম।

এইদিন রাতে ভূতেশানন্দজী উত্তরকাশীর বিভিন্ন সাধু সম্প্রদায়ের কথা ও নিজের তপস্যার কথা বললেন, "কত রকমের সাধু আছে। ধ্যানী সাধু আছেন, আবার বাবু সাধু ঘড়ি হাতে রেডিও নিয়ে ঘুরছে। পলিটিশিয়ান সাধু দল পাকাচ্ছে। কৈলাসের পথে এক নাগা সাধুর আর এক সাধুর সঙ্গে ঝগড়া হল এবং তাকে ঠেলে জলে ফেলে দিল। জনৈক দরদি সাধু নিজের কম্বল অপর সাধুকে দান করল। পাগলা সাধু আছে, আবার পণ্ডিত সাধুও আছে।" মহারাজের স্মৃতি ও পর্যবেক্ষণশক্তি ছিল তুলনাহীন।

ভূতেশানন্দজী প্রতিদিন প্রাতরাশের পর বেলুড় মঠে যাবার জন্য তৈরি হতেন। আমি জুতো লুকিয়ে রাখতাম যাতে তিনি চলে না যান। আমাদের লক্ষ করে বলতেন, "আমাকে মঠে যেতে দাও।" আমি বলতাম, "কাল যাবেন।" তারপর দিন তাঁর গেঞ্জি

ও কাপড় সাবানজলে বালতিতে ভিজিয়ে দিয়ে বলতাম, "আপনার কাপড়, গেঞ্জি ময়লা। কাল যাবেন।" "এই দেখো, আজও তোমরা আমাকে যেতে দিলে না। দেখো তো, নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দজী) কী মনে করবেন! তুমি বড় দুষ্টু।" আমার দুষ্টুমি, ছেলেমানুষি বা ছাত্রসুলভ মনোবৃত্তি মহারাজের সঙ্গে একটা স্বাধীন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতিয়ে তুলেছিল।

অতীতের সেই ছেড়ে-আসা দিনগুলির কথা যখন মনে পড়ে তখন কতই না আনন্দ হয়। সেই প্রথম দর্শন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যে, অপর কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ওইরকম হয়নি। মহারাজ তখন রাজকোটের মোহন্ত। ৭.১০.১৯৬০ তারিখে আমাকে লিখেছিলেন, "ঠাকুর আমাদের সমগ্র সঙ্ঘকে এইরকম পবিত্র মধুর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ রাখুন; তা না হলে সঙ্ঘজীবনের কোনও অর্থই নাই। আমাদের জীবনের আদর্শ ঠাকুর-স্বামীজী। তাঁরা যদিও অসীম এবং আমাদের সঙ্কীর্ণ সীমার বাইরে, তবু যে পরিমাণে আমাদের তাঁদের ছাঁচে ঢালতে পারব সেই পরিমাণে আমাদের সাধনা সার্থক এবং ধর্মজীবন পূর্ণ হবে। অপূর্ণ থাকতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ কারও পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে আদর্শে পৌঁছবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তাতে আনন্দ হোক বা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই হোক। স্বামীজীর কথা মনে রেখো—'রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামকে নিয়ে থাকতে হবে?' তবে আমরা দুর্বল হলেও তাঁদের অনন্ত শক্তি আমাদের পিছনে আছে। সুতরাং অভীঃ।"

১৯৬১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মঠ ও মিশনের বহু সাধু বেলুড় মঠে আসেন। কারণ, স্বামী মাধবানন্দজী আমেরিকায় ব্রেন সার্জারির জন্য যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন সঙ্ঘের প্রবাদপ্রতিম সন্ন্যাসী ও শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য। স্বামী ভূতেশানন্দজী রাজকোট থেকে এসেছিলেন মাধবানন্দজীকে দেখতে এবং অদ্বৈত আশ্রমে কয়েকদিন ছিলেন। ১৯৬১ সালের প্রারম্ভে অদ্বৈত আশ্রম ৪ ওয়েলিংটন লেন থেকে ৫ ডিহি এন্টালি রোডে স্থানান্তরিত হয়। একদিন গম্ভীরানন্দজী ভূতেশানন্দজীকে রবিবারের ক্লাস নিতে বলেন। সেদিন ভূতেশানন্দজীর গলা ভাল ছিল না। তিনি সকাল থেকে গরম জলে নুন দিয়ে কয়েকবার gurgle করতে থাকেন। তাঁর স্বর সেদিন সত্যিই খুব খারাপ ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন বক্তৃতা না দিতে। তিনি বললেন, "ঠাকুরের কাজ। দেখবে আমি ঠিক হয়ে যাব।" তিনি সেই ভাঙা গলায় একঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। দেহ ভুলে ঠাকুরের কাজ। ঘটনাটি তুচ্ছ, তবে শিক্ষণীয়।

তারপরেও মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমে কয়েকবার এসেছেন। একবার মনে আছে কনখলের মাখন মহারাজ (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী) ও ভূতেশানন্দজী একসঙ্গে আমাদের অতিথি হয়েছিলেন। এক গুজরাতি ভক্ত মহারাজকে এক বাক্স গেঞ্জি দেয়। মাখন মহারাজ তা থেকে কয়েকটা গেঞ্জি নিয়ে বলেন, "এই বিজয়, তোমার অনেক ধনী ভক্ত আছে। এ-গেঞ্জিগুলি আমি নিলাম।" মহারাজ বললেন, "দেখুন মাখন মহারাজ, এ-গেঞ্জি নেবেন না। আমাদের আশ্রম গরিব। ভিক্ষার দ্বারা চলে।" মাখন মহারাজ বললেন, "আরে, আশ্রম তো ভিক্ষার দ্বারাই চলে। তাছাড়া আর কীভাবে চলবে?" উভয়েই ছিলেন ব্যয়কুণ্ঠ। আমি দেখলাম দুই প্রাচীন সাধু

।১৭।

বালকবৎ গেঞ্জি নিয়ে টানাটানি করছেন!

পুষ্প নামে মহারাজের এক গুজরাতি মহিলা-ভক্ত কলকাতায় থাকতেন। মহারাজ তাঁকে ছোটবয়স থেকে জানতেন। একবার তিনি মহারাজকে দেখতে এলে আমরা ঠাট্টা করে বললাম, "আপনি সাধুদর্শনে এসেছেন। গাঠিয়া-ফল-মিষ্টি ছাড়া সাধুদর্শন হয়?" তিনি হেসেছিলেন এবং পরদিন প্রচুর গাঠিয়া ও ফল-মিষ্টি নিয়ে হাজির হন। মহারাজ আশ্রমে থাকলে আশ্রম বেশ গমগম করত।

মহারাজ যেখানেই যেতেন সেখানেই শাস্ত্রের ক্লাস নিতেন ও ঠাকুর-মায়ের সন্তানদের প্রসঙ্গ করতেন। ভগবৎপ্রসঙ্গ দ্বারা তিনি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতেন যে, মন স্বভাবতই ঊর্ধ্বগামী হত।

রাজকোট আশ্রম থেকে মহারাজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-র গুজরাতি অনুবাদ প্রকাশ করবেন। আমাকে লিখলেন মাস্টারমশাইয়ের পৌত্র অনিল গুপ্তের কাছ থেকে অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি নিয়ে তাঁকে পাঠাতে। আমি অনিলবাবুকে বলতেই তিনি সানন্দে অনুমতি দেন। মহারাজ বিভিন্ন ভাষা জানতেন। গুজরাতি 'কথামৃত'-এর তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন।

১৯৬৬ সালে তিনি রাজকোট থেকে বেলুড় মঠে মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদক হয়ে আসেন। প্রতি রবিবার মঠের লাইব্রেরিতে 'কথামৃত' ক্লাস নিতেন। বহু লোক আসত। ১৯৭০ সালে লক্ষ্ণৌতে বিবেকানন্দ পলিক্লিনিক উদ্বোধন হয়। ১৫২ জন সাধু সমবেত হন। মহারাজ গিয়েছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম। শ্রীধরানন্দজী অপূর্ব ব্যবস্থা করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে আমরা অনেকে মহারাজের সঙ্গে বাসে অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য ও ব্রহ্মাবর্ত দেখতে যাই। অযোধ্যা দর্শন করে সরযূতে স্নান সেরে খেতে গিয়ে দেখি, রামভক্ত হনুমানরা আমাদের প্যাকেটের খাবার বাসে ঢুকে তছনছ করে দিয়েছে। মহারাজ নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। কোনওমতে কিছু মুখে দিয়ে আমরা লক্ষ্ণৌ ফিরলাম। তারপর ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে কাশী যাই।

একদিন মহারাজকে বললাম, "চারটে পয়সা দেবেন, বাদামভাজা কিনব।" তিনি বললেন, "দিতে পারি, যদি ওই পয়সা তুমি আবার ফেরত দাও।" আমি বললাম, "তাহলে পয়সা চাই না।" আমি জানতাম তিনি আমার সঙ্গে মজা করছেন। তারপর একগাল হেসে বললেন, "দেখো, পয়সার ব্যাপারে আমি খুব হুঁশিয়ার। একবার কোথায় যাচ্ছি, হিতানন্দ ও বীতশোকানন্দ পান খেতে চায়। আমি দশ টাকার একটা নোট দিলাম। ওরা পানওয়ালার কাছে ওই নোট নিয়ে গেলে, সে বলল যে তার কাছে ভাঙানি নেই। হিতানন্দ তখন বলে, 'ওরে, ও বিজয় মহারাজের টাকা। ও কি কখনও ভাঙতে চায়!' " নিজেকে নিয়ে কেউ যখন কৌতুক করে তখন হিউমারের ক্লাইম্যাক্স হয়।

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে কয়েকদিন ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব কলকাতা ভেসে যায়। আমরা অদ্বৈত আশ্রম থেকে রিলিফ করি। মহারাজ তখন মঠে রিলিফের ইনচার্জ। আমি চাল, ডাল, পাউরুটি কেনার টাকা চাইলে তিনি বলেছিলেন, "দেখো, হৃদয়বান হওয়া ভাল, কিন্তু পয়সাকড়ির হিসাব ঠিকমতো রাখবে। জনগণের দান জনগণের সেবায় ব্যয় হবে। তুমি দেবে তোমার ভালবাসা ও নিঃস্বার্থপরতা।"

১৯৭১ সালে স্বামীজীর জন্মদিনে বেলুড় মঠে গম্ভীরানন্দজী আমাকে বললেন, "ওহে তোমাকে হলিউডে যেতে হবে। তৈরি হয়ে নাও।"

।১৮।

আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি বললাম, "Wrong selection।" তিনি বললেন, "তুমি যদি যেতে না চাও, আমাকে লিখে দাও। আমি ট্রাস্টি মিটিংয়ে জানাব।" আমি চুপ করে গেলাম। পূজনীয় নির্বাণানন্দজী আমাকে select করে আগেই বলেছিলেন, "তুমি না কোরো না।" যাহোক, ভূতেশানন্দজী ছিলেন আমার কাছে 'স্নেহময়ী মাতা'। তিনি সাহস দিয়ে বললেন, "ঠাকুরের কাজ। কর্তৃপক্ষ যেখানে পাঠান, সেখানেই যাবে। বন্দনানন্দের পরিবর্তে প্রভবানন্দজীকে আমাদের একজন সহকারী পাঠাতে হবে; তবে তোমার মতো একটা গুড বয়কে হলিউডে পাঠাবার ইচ্ছা ছিল না।" বললাম, "আমি আমেরিকায় গিয়ে রামকৃষ্ণ হিপি মুভমেন্ট শুরু করব, তখন আপনারা কী করবেন?" মহারাজ হাসতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে কথা বলা যেত।

অবশেষে বেলুড় মঠ থেকে যাত্রা করি ২৭ মে ১৯৭১। যাবার আগে মহারাজ বললেন, "দেখো, কাল সকালে তুমি আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবে, আমি তোমাকে টেবিল ম্যানার্স শেখাব।" তখনকার মিশন অফিসের উপরতলায় (শ্রীমন্দিরের মুখোমুখি বাড়ির দোতলায়) ডানদিকের ঘরে মহারাজ থাকতেন। তাঁর সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খেলাম—এক পিস টোস্ট, একটি ছোট সিঙ্গাপুরী কলা, একটি প্রসাদী সন্দেশ (নিজে না খেয়ে আমার জন্য রেখে দিয়েছেন), এক কাপ বেলুড় মঠের জনতা চা। তিনি একটি অপূর্ব সুন্দর কথা বলেছিলেন, "মানুষকে ভালবেসে আপন করে নিলে বিদেশই স্বদেশ হয়।" আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিলেন। সব মনে নেই।

৩১ মে ১৯৭১ গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া, বম্বেতে স্বামীজীর ব্রোঞ্জ মূর্তির উদ্বোধন হয়। তার পরদিন আমি মস্কো হয়ে প্যারিস যাই। সেখানে বিদ্যাত্মানন্দজীর দেখা না পেয়ে আমি ইন্ডিয়ান অ্যামবাসাডারের বাড়িতে উঠি। মহাবিপদের মধ্যে পড়ি। তারপর বিদ্যাত্মানন্দজী আমাকে আশ্রমে নিয়ে যান। হলিউড পৌঁছে আমি গম্ভীর মহারাজকে চিঠিতে আমার বিপদের কথা জানাই। তিনি চিঠিতে লেখেন: তুমি আমাদের ফিলোসফিটা জান। ঠাকুর তোমাকে বিপদে ফেলে কাঁদাবেন, আর তুমি বলবে—"প্রভু তুমি বড় দয়ালু।" এই প্রসঙ্গে সেন্ট টেরিসার কথা মনে পড়ে। তিনি স্পেনের টোলিডোতে একটা কনভেন্ট স্থাপন করতে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁর ঘোড়ার গাড়ি উল্টে যায়, তিনি আহত হন। ক্ষোভে টেরিসা যিশুকে বলেন, "আমি তোমার কাজ করতে যাচ্ছিলাম, আর তুমি আমাকে এই শাস্তি দিলে।" যিশু বললেন, "Teresa, this is the way I test my devotees." টেরিসা উত্তরে বলেন, "Lord, that is the reason their numbers are few."

১৯৭১ সালের ১১ জুন হলিউড পৌঁছই। মহারাজের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল। তারপর ১৯৭৭ সালে ভারতে ফিরি। মহারাজ তখন কাঁকুড়গাছিতে মঠ-মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। দেশে থাকতে আমি বেশি ঘুরিনি, ছুটিও পাইনি আর পয়সাও ছিল না। অমরনাথ, কেদারনাথ, বদরিনাথ দর্শন করে নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন করতে যাব। ১১ অগস্ট মহারাজকে বললাম, "আপনি নেপাল যাবেন?" তিনি বললেন, "তুমি যদি নিয়ে যাও তাহলে যাব।" আমি বললাম, "চলুন। আমি আপনার সেবক হব।" মহারাজ বললেন, "না, তুমি সেবক হলে ভাল দেখাবে না। শিখরেশ (স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দ) আমার সেবক।" আমি বললাম, "ঠিক আছে। আমি শিখরেশের

।১৯।

ভাড়াও দেব।" তারপর পীযূষ মহারাজও (স্বামী পূজানন্দ) আমাদের সঙ্গে যান।

২৪ অগস্ট আমরা প্লেনে কাঠমাণ্ডু গেলাম এবং রত্ন নামে এক নেপালি ব্রহ্মচারীর পূর্বাশ্রমের বাড়িতে উঠলাম। তাঁর বাবা ডাক্তার পৌদয়াল এয়ারপোর্টে আমাদের receive করেন। ওইদিন সন্ধ্যায় পশুপতিনাথের আরতি দেখলাম। ২৫ অগস্ট সকালে রত্নের বাবা ও জ্যাঠামশায় (নেপালের মহারাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী) ভাল গাড়ি করে গাইডসহ আমাদের সব দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। বুড়ো নীলকণ্ঠ, গুহ্যেশ্বরী মন্দির, স্বয়ম্ভূনাথ, মহাবোধি, ভরতপুরের দত্তাত্রেয়ের মন্দির। সকালে প্রথম পশুপতিনাথের মন্দিরে পূজা দিতে গেলাম। মহারাজের জন্য বিশেষভাবে দর্শনের ব্যবস্থা হল। তারপর শিবদর্শন করে তিনি মন্দিরের চত্বরে এক সিঁড়ির উপর বসে চাদরে হাত ঢেকে জপ করতে লাগলেন। এখনও সে-ছবি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং ওই ছবি আমার কাছে আছে। মনে পড়ে ১৯৫৯ সালে কাশীতে হরিপ্রেমানন্দজী (শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য) আমাকে শিখিয়েছিলেন কী করে মন্দিরে দেববিগ্রহ দর্শন করতে হয়। বিশ্বনাথের মন্দিরের ভিতর তো দারুণ ধাক্কাধাকি। তাই বাইরে এসে এক শ্বেতপাথরের বেঞ্চিতে বসে দশ-পনেরো মিনিট বিগ্রহদর্শনের কথা ভাবতে হয় ও জপ করতে হয়। এতে মনে একটি গভীর ছাপ পড়ে। মহারাজকেও তাই করতে দেখলাম। এসব প্রাচীন সাধুদের কাছে কত কী শেখার আছে!

ওইদিন বিকেলে আমরা ডাক্তারের গাড়িতে করে শহর থেকে দূরে দক্ষিণাকালী দর্শন করতে যাই। সেখানে দশমহাবিদ্যার মূর্তি ও দুজন তান্ত্রিক দেখলাম। ফেরার পথে মাঝরাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। তখন সন্ধ্যা ৮/৯টা হবে। চতুর্দিক অন্ধকার। পথ জনশূন্য। হিমালয়ের ঠান্ডা হাওয়া। আমরা চার জন, ড্রাইভার ও গাইড। দেখলাম, মহারাজ চুপ করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। আমরা দুর্ভাবনায় অস্থির। কী করে শহরে পৌঁছব! বেশ কিছু সময় পরে দেখলাম একটা ট্রাক আসছে। হাত তুলে গাইড গাড়ি থামাল এবং ড্রাইভারকে আমাদের শহরে পৌঁছে দিতে রাজি করাল। শিখরেশ ও আমি মহারাজকে ঠেলে তুলে সেই উঁচু ট্রাকের ওপরে ড্রাইভারের পাশের আসনে বসালাম এবং আমরা দুজনে কোনওমতে মহারাজের পায়ের কাছে বসলাম। পীযূষ মহারাজ ও অপর দুজন ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাস্তার ওপর দাঁড়ানো নির্বিকার মহারাজকে দেখে মনে হয়েছিল—ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ। "ন প্রিয়ে অপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—কিছুতেই বিচলিত হন না। সে-ছবি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কাঠমাণ্ডু ও পাটানের কৃষ্ণমন্দির, বুদ্ধমন্দির প্রভৃতি সব দর্শন করে ২৬ অগস্ট বিকেলে কলকাতায় ফিরলাম। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে মহারাজ ও আমি পাশাপাশি বসেছিলাম। চা ও ঠান্ডা ভেজিটেবল চপ খেতে দিল। আমি খেলাম না। মহারাজ খেলেন। ব্যস, কাঁকুড়গাছিতে এসে তাঁর খুব পেট খারাপ হল। খবর পেয়ে আমি অদ্বৈত আশ্রম থেকে ফোন করলাম। আমি বললাম, "আপনি ওই ঠান্ডা চপ খেলেন কেন? দেখলেন না, আমি খেলাম না।" তিনি উত্তরে বললেন, "আমার পেট খারাপের জন্য তুমি দায়ী। তুমি কি জান না যে আমার বালকস্বভাব? যে যা দেয় তা-ই খাই। তুমি কেন আমার হাত থেকে চপ কেড়ে নিলে না?" আমি ভাবলাম, এমন আত্মভোলা সাধুকে নিয়ে চলা মুশকিল। *ক্রমশ*

।২০।